শায়খ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ'র সম্মানীত স্ত্রী

'উমায়মা হাসান আহমাদ' এর লেখা আত্মজীবনীমূলক ধারাবাহিক রচনা

পর্ব-১

বিশুদ্ধ রক্তস্নাত আফগান

শায়খ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ'র সম্মানিত স্ত্রী উমায়মা হাসান আহমাদ এর লেখা আত্মজীবনীমূলক ধারাবাহিক রচনা

(পর্ব-১)

বিশুদ্ধ রক্তস্নাত আফগান

[জামাআত কায়েদাতুল জিহাদের অফিসিয়াল ম্যাগাজিন "উম্মাতুন ওয়াহিদাহ, ইস্যু-০১" থেকে অনূদিত]

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নামে শুরু করছি যিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল। সাহায্য ও সক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। সালাম ও দরূদ মানবজাতির জন্য রহমত স্বরূপ আল্লাহর রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তার পরিবার, সাহাবাগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা এই সত্য পথের উপর থাকবেন তাদের উপর।

অনেক মুহাজির বোন আমাকে বারবার অনুরোধ করেছেন আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের সর্বশেষ অভিযানের সময়ে আমার দেখা কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে। আমি কিছু ঘটনা লিখেছিলাম তবে সেগুলো দুর্ভাগ্যক্রমে হারিয়ে যায়। আমি আবারও লিখার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম, তবে হিজরতের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির কারনে দীর্ঘদিন লেখার সুযোগ করে উঠতে পারিনি।

পরবর্তীতে আমি মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংঘটিত আমেরিকার অপরাধসমূহের সাক্ষ্যগুলো লিখতে শুরু করি। এটা ইসলাম আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিদ্বেষ আর ঘৃণার স্বরূপ তুলে ধরার এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমি এখানে যা তুলে ধরছি তা আফগানিস্তানে মুহাজির মুজাহিদীনদের আত্মত্যাগের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে একটি মাত্র।

মুজাহিদীনদের জন্য বিশ্বের অন্যান্য জায়গাগুলোতে পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাওয়ায় ১৯৯৬ সালে আমি আফগানিস্তানে হিজরত করি। আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমরের নেতৃত্বে আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারাহর উত্থান এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন বিশ্বজুড়ে মুজাহিদীনদের জন্য স্থান সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। এসময়ে অসংখ্য মুজাহিদ এই বরকতময়

ভূমিতে হিজরত করেন আর তাঁদেরকে সাদরে বরণ করে নেন এই সম্মানিত ন্যায়নিষ্ঠ আফগান জাতি। এমন মানুষদের একত্রিত হবার ব্যাপারটা আমেরিকা আর তার দোসরেরা সহ্য করতে পারল না। প্রথমবার আফগান আর আরবরা এমন একত্রিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়। সেবার রাশিয়া পরাজিত হয়ে আফগানিস্তানের ভূমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল।

এরপর আবারও আফগান আর আরবরা মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে ইসলামী ইমারাহর পতাকাতলে একত্রিত হয়েছিলেন। সত্যিকারের স্বাধীনতার বরকত নিয়ে এবার তারা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই লড়াইয়ের লক্ষ্যবস্তু ছিল ইহুদি, খ্রিস্টান আর মুসলিম রাষ্ট্রে এদের বিশ্বাসঘাতক সাগরেদরা - যারা কিনা মুসলিম ভূমিগুলোকে শোষন করেছে, সম্পদ লুটপাট করেছে আর মুসলিমদের অপমানিত করেছে।

আর তাই আমেরিকা, ইহুদী আর তাদের দালালরা আতংকিত হয়ে সদ্যগঠিত ইসলামী ইমারাহকে শুরুতেই ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। আর তাদের এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইসলামী ইমারাহর বিরুদ্ধে তারা সর্বশক্তি দিয়ে বিমান হামলা শুরু করে। ৯/১১ ছিল আমেরিকার জন্য একটা অজুহাত মাত্র। অনেকেই সেই সময় বিশ্বাস করত যে, ৯/১১ এর ঘটনার পর আমেরিকার প্রতিশোধ নেবার পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল কিংবা ইচ্ছাকৃত ভাবে উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে - ৯/১১ এর আক্রমণ হয়েছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকার চরম নিপীড়নের প্রতিবাদ হিসেবে। ফিলিস্তিনের

উপর ইসরায়েলের অন্যায় অত্যাচারে আমেরিকার একপেশে সমর্থন আর মুসলিম দেশসমূহে দুর্নীতিবাজ জালিম সরকার চাপিয়ে দেয়ার প্রতিরোধ হিসেবে।

আফগানিস্তানে আমেরিকার অবৈধ দখলদারিত্ব শুরু হলে আমরা আমাদের কাবুলের বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলাম। আমার সাথে ছিলেন আমার আগের স্বামী তারিক আনওয়ার সাইয়েদ রাহিমাহুল্লাহ, তার দ্বিতীয় স্ত্রী সায়্যিদা আহমাদ হালওয়া। সায়্যিদা হালওয়া ছিলেন আহমাদ নাজ্জার রাহিমাহুল্লাহর স্ত্রী, তার শাহাদাতের পরে তারিক আনওয়ারের সাথে সায়্যিদা হালওয়ার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে তারিক আনওয়ারের শাহাদাতের আগ পর্যন্ত আট মাস তারা একসাথে ছিলেন।

আমাদের সাথে আরও ছিলেন নাসর ফাহমি নাসর, তার স্ত্রী উম্মে আয়াত সা'দিয়া আহমাদ বুয়ুমি ও তাদের সন্তানেরা (রাহিমাহুমুল্লাহ)। উম্মে আয়াত সা'দিয়া ছিলেন শহীদ নাযিহ নুশি রশীদ রাহিমাহুল্লাহর স্ত্রী। তাঁর শাহাদাতের পরে নাসর ফাহমি নাসর তাঁকে বিয়ে করেন, আর তারা দুজন একসাথেই শাহাদাত বরণ করেন।

ডা. আয়মান আল যাওয়াহিরির স্ত্রী উম্মে ফাতিমা ইযযাহ আনওয়ার নুয়াইর রাহিমাহুল্লাহ আর তাদের চার সন্তানও আমাদের সাথে ছিলেন। এই সময়ে ডা. যাওয়াহিরি শাইখ ওসামা রাহিমাহুল্লাহর সাথে তোরাবোরায় অবস্থান করছিলেন। আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল সায়্যেদ আর উনার স্ত্রী খাদীজা তাদের ছোট দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাদের সাথে ছিলেন। খাদীজা ছিলেন

শাইখ আবু ইসমাইল আহমাদ বিসওনী আল দুয়াইদারের মেয়ে। আল্লাহ তাঁদের সবার উপর রহম করুন।

আমরা সবাই একসাথে খোস্ত যাচ্ছিলাম। সেখানে আবু হামযা আল যাওফী রাহিমাহুল্লাহ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা তার বাসায় এক সপ্তাহ অবস্থান করি। এরপর উম্মে ফাতিমা, উম্মে আয়াত, খাদীজা আর তাদের সন্তানদেরকে উম্মে হামযা আল যাওফীর কাছে রেখে আমরা ওয়ারদাকের পথে রওনা হই। ওয়ারদাকে আমরা উস্তাদ মুহাম্মাদ ইয়াসির (আল্লাহ তাঁকে কবুল করে নিন) এর বাসায় দুইমাস থাকি। এরপর আমরা তাশরাখে যাই আর আবারও সবাই স্বামী সন্তানদের সাথে একত্রিত হই, একমাত্র ডা. যাওয়াহিরি ব্যতিত। আমরা তাশরাখে প্রায় দুই-তিন সপ্তাহ অবস্থান করি আর সেখানে কিছুটা নিরাপদ অনুভব করি। তবে একের পর এক শহর নর্দান এলায়েন্সের দখলে আসতে থাকে আর পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করে। তাশরাখ, লোগার প্রদেশের অংশ ছিল। লোগারের পতনের পর আমার স্বামী সহ অন্যান্য ভাইয়েরা আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েন। নর্দান এলায়েন্স আমাদের এলাকার বেশ কাছে চলে এসেছিল। তাই আমরা কান্দাহারে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিই।

দুপুরের দিকে বের হবার সময় এলাকাবাসীর কাছে জানতে পারলাম যে কান্দাহারে যাবার রাস্তা ট্যাংক দিয়ে অবরোধ করা হয়েছে আর সেখানে যুদ্ধবিমান টহল দিচ্ছে। এই পথে যাতায়াতকারী যেকোন গাড়িই তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। আমরা গাড়িতে উঠে

রওনা দেয়ার আগ মুহূর্তে এলাকাবাসীর কথাবার্তা শুনে কান্দাহার না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তারা আমাদের আশ্বস্ত করে বললেন, 'ইনশাআল্লাহ চিন্তার কিছু নেই, আমরা আপনাদের সাথে আছি'।

আমাদের উপড়ে প্রচুর যুদ্ধবিমান উড়ছিল। পরিস্থিতি বেশি ভালো মনে না হওয়ায় ভাইরা সেই রাতেই খোস্ত চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আমাদের ক্যারাভান আগের মত সজ্জিত করা হয় - একটা বাসে আমি, আমার আগের স্বামী তারিক, সায়্যিদা হালওয়া আর তার পাঁচ সন্তান। আরেকটা বাসে নাসর ফাহমি নাসর, তাঁর স্ত্রী ও সাত সন্তান এবং তাদের সাথে ডা. যাওয়াহিরির স্ত্রী ও চার সন্তান। আরেকটা গাড়িতে মুহাম্মাদ সায়্যেদ, তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান। রাত আটটার দিকে আমরা খোস্তের পথে রওনা দিই। সেটা ছিল নভেম্বর মাসের প্রচন্ড শীতের এক রাত। আমরা দ্রুত গতিতে চলছিলাম। পুরো পথ জুড়েই তালিবানদের উপস্থিতি ছিল। তারা আমাদেরকে অধিকতর নিরাপদ পথ দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। কোন রাস্তাগুলো নর্দান এলায়েন্স বন্ধ করে দিয়েছে সেগুলো জানাচ্ছিলেন। আমাদের মাথার উপরে সারাক্ষণই যুদ্ধবিমানের আনাগোনা ছিল। আমরা সেগুলোর দিকে খেয়াল রাখছিলাম আর প্রতিটা মুহূর্তে আল্লাহর কথা স্মরণ করছিলাম। গার্দেজের প্রধান সড়কে পৌঁছে তালেবানদের এক বিরাট দল দেখে আমরা অবাক হলাম। তখন রাত প্রায় ১১টা। তারা আমাদেরকে সামনের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে বললেন যে খোস্ত যাবার রাস্তা বন্ধ। তাই বাধ্য হয়ে আমরা গার্দেজেই শাইখ জালালুদ্দিন হাক্কানীর বাসায় আশ্রয় নিই।

গেস্ট হাউজ হিসেবেই তৈরি করা বাসাটা ছিল বেশ বড়। আমরা সবাই দ্বিতীয় তলায় উঠে যাই। এক ঘরে সব নারী ও শিশু আর আমাদের সামনের ঘরে সব পুরুষ ও ছেলেরা। দুই ঘরের মাঝে ছিল এক লম্বা করিডর। যার শেষ প্রান্তে বাথরুম। আমরা আমাদের ঘরে ঢোকার পর পরই আকাশে বিমানের আওয়াজ বাড়তে থাকলো। খাদিজার অনুমতি নিয়ে একজন বোন তার স্বামীকে বিমানগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে যান। তার স্বামী তাকে আশ্বস্ত করেন যে ভয়ের কিছু নেই আর বলেন আল্লাহর উপর ভরসা করতে। বোনটি আমাদের ঘরে এসে এই আশ্বাসের কথা জানান।

এই কথা শুনে উম্মে আয়াতের মুখে চমৎকার এক নূর চলে আসে আর তিনি বলেন, “হয়ত আজ রাতে ঘুমের মধ্যে আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে শাহাদাত দান করবেন। আমি জান্নাতে আমার রবকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করব”। তাঁর কন্যা আয়াত আমার সাথে কথা বলছিলো। আমি ওর চেহারাতে এক প্রশান্তির নূর দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি তাকে বললাম, ‘তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে’। সে হেসে উত্তর দিল, ‘আন্টি আপনি সবসময় আমার অধিক প্রশংসা করেন!’ এই মেয়েটি সম্পূর্ণ কুর’আন মুখস্ত করেছিল আর তার তিলাওয়াত ছিল খুবই সুন্দর। আল্লাহ তা’আলা তাদের সবাইকে কবুল করে নিন।

আমরা সবাই একসাথে মাগরিব আর ঈশার সালাত পড়ে নিয়েছিলাম। তবে খাদীজা বিনতে আবি ইসমাঈল পড়েনি, তাই সে নামায পড়তে শুরু করল। তার দুই সন্তান বসে ছিল তার পায়ের কাছে। আমরা ঘরের ডানদিকে তোশক বিছিয়ে ঘুমের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম।

রাতের যিকির শুরু করার সময় যুদ্ধবিমানের আওয়াজ কমে আসতে লাগল। মনে হল সেগুলো অনেক দূরে চলে গেছে। চারপাশে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা অনুভব করছিলাম।

হঠাৎ করেই প্রথম মিসাইলটি আঘাত হানলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের উপর বাসার ছাদ ধ্বসে পড়ল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম শহীদ হল উম্মে আয়াত, তাঁর মেয়ে আয়াত, আয়াতের ছোট বোন আয়েশা। আয়েশার যমজ বোন হাফসা বেঁচে গিয়েছিল। আয়েশার বয়স ছিল মাত্র এক বছর তিনমাস। উম্মে আয়াতের ছোট ছেলে মুহাম্মাদ ব্যাথায় কান্না করতে করতে বলছিল, 'আন্টি আমাকে এখান থেকে বের করুন'। আমি বললাম, 'ওয়াল্লাহি, বাবা, আমি একদমই নড়তে পারছিনা'। বাসার ছাদ আমাদের উপর চেপে ছিল। উম্মে ফাতিমাকে আমার নাম ধরে ডেকে বলতে শুনলাম, 'আমার বুকের উপর থেকে পাথর সরিয়ে দাও'। কান্নাজড়িত কণ্ঠে আমি তাকে বললাম যে আমি নড়তে পারছিনা। এরপর আমি আর তাদের কোনও আওয়াজ শুনতে পাইনি। মুহাম্মাদ, উম্মে ফাতিমা কারোরই না। আল্লাহ তাঁদেরকে কবুল করে নিন।

মিসাইল আঘাত হানার সময় খাদিজা সালাত পড়ছিল। সে আমার পায়ের কাছে পড়ে গিয়েছিল। আমি তার দম বন্ধ হয়ে যাবার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। আমি মরিয়া হয়ে আমার হাত বাড়িয়ে তার উপর চাপা পড়া একটি কাথা সরানোর চেষ্টা করলাম, সম্ভবত কাথাটির কারণেই তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কোন লাভ হল না। আমি এক ইঞ্চিও নড়তে পারলাম না। ছাদটা আমার বাম কাঁধের উপর শক্তভাবে চেপে বসেছিল।

এই ছাদের নিচে আরও ছিলেন সায়্যিদা হালওয়া, তার দুই ছেলে-আড়াই বছরের তাসনীম আর চার বছরের সালাহ। সালাহ তিনবছর আগে আফগানিস্তানের মুরতাদ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এক অভিযানে শহীদ হয়। আমরা এই ক'জন একটুও আহত হইনি। আমাদের ঠিক পিছনে থাকা একটি বইয়ের শেলফ ছাদ আর আমাদের মাঝে পড়েছিল, তাই সরাসরি আমাদের উপর ছাদ পড়েনি। হঠাৎ আমরা উপরে পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই। আমরা চিৎকার করতে শুরু করি, এই আশায় যে ধ্বসে পড়া ছাদের এক ছোট ফাটল দিয়ে তারা আমাদের আওয়াজ শুনতে পাবে। আমরা অবাক হয়ে বুঝলাম যে ছাদে হাটছিল উম্মে আয়াতের তেরো বছরের মেয়ে হাজার। মিসাইল আঘাত হানার সময় সে তার বোন হাফসার সাথে ঘুমিয়ে ছিল। হাফসাকে পরবর্তীতে ধ্বংস্তুপ থেকে উদ্ধার করা হয়। ছাদে আরও ছিল হাজারের এগারো বছর বয়সী বোন ঈমান, আর ডাক্তার যাওয়াহিরির এগারো বছরের মেয়ে খাদিজা। তারা সবাই নিজেরাই ধ্বংস্তুপ থেকে বের হয়ে এসেছিল।

আমরা চিৎকার করে তাদের বললাম , তোমরা কি কিছু ইট-পাথর সরাতে পারবে যাতে আমরা বেরোতে পারি? তারা বলল যে তারা পারবেনা। এরপর আমরা কিছু পুরুষকণ্ঠ শুনতে পেলাম। তারা আরবীতে বলছেন- 'কেউ কি আমাদের শুনতে পাচ্ছেন?' ছাদে থাকা মেয়েরা তাদের জবাব দিল। এসময়ে আবারো আকাশে যুদ্ধবিমানের আওয়াজ শুনে আমরা ভীত হয়ে পড়লাম। আমাদের চারপাশের মানুষের আওয়াজ স্তিমিত হতে লাগল আর জেটের গর্জন বাড়তে লাগল। পরে আমরা জানতে পারি যে ছোট মেয়েগুলো জেট থেকে মিসাইল বেরোতে

দেখে আতংকিত হয়ে দৌড়ে উঠানে চলে যায়। সেখানের একমাত্র অক্ষত দেয়ালের দিকে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকে।

দ্বিতীয় মিসাইলটি আবারও ছাদে আঘাত হানে। ধ্বংস্তুপের মাঝের গর্ত দিয়ে এক বিরাট আগুনের হলকা ছুটে আসে। তবে এতে এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে। এই বিস্ফোরণের তোড়ে আগের ভেঙ্গে পরা ছাদ আমাদের উপর থেকে সরে গেলো। অবশেষে আমরা নড়তে সক্ষম হলাম।

বের হয়ে আসা মেয়েরা বিস্ফোরনের হলকায় দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ তারা সবাই বেঁচে গিয়েছিল। দ্বিতীয় মিসাইলের আঘাতে যে ফাটল তৈরি হয় তাতে ডা. যাওয়াহিরির মেয়ে নাবিলা বের হয়ে আসে। সে সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল।

আবারও পুরুষেরা ফিরে আসেন আর উঠান থেকে মেয়েগুলোকে নিয়ে কাছের এক বাসায় রেখে আসেন। এরপর ফিরে এসে তারা ছাদের ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে আমাদের বের করতে শুরু করেন। প্রথমেই নাসর ফাহমির মেয়ে হাফসাকে বের করে তৎক্ষণাৎ রেড ক্রিসেন্টের ক্লিনিকে নেয়া হয়। এরপর বের করা হয় মুহাম্মাদ বিন নাসরকে, তার আঘাত ছিল গুরুতর। কয়েক ঘন্টা পরই এই নিস্পাপ শিশু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। লোকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করছিল আমাদের বের হয়ে আসার পথ তৈরি করতে। তারা পুরোটা সময় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছিলেন আর আমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন- ‘বলুন লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ, আল হালীম আল কারীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, রাব্বাস সামাওতা ওয়া রাব্বাল আরদ্ব, রাব্বাল আরশীল কারীম'।

অবশেষে তারা ছোট এক গর্ত করতে সক্ষম হন যার ভিতর দিয়ে সালাহ আর তাসনীমকে বের করা হয়। এরপর ওদেরকে ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। গর্তটা আরেকটু বড় হবার পর সেখান থেকে সায়্যিদা হালওয়া বের হয়। শাইখ জালাল হাক্কানী ছাদের উপর থেকে আমার উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনার হাত দিন বোন'। আমি প্রথমে ইতস্তত করি। কিন্তু ততক্ষণে আবারও আকাশে যুদ্ধবিমানের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। শাহাদাতবরণের আশায় আমি নিজেকে আটকে রাখলাম। শাইখ জালাল আবারো চিৎকার করে আমাকে বললেন, 'বোন দয়া করে আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, বিমান আমাদের মাথার উপরেই।' আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি টেনে আমাকে তুলে আনলেন। ধ্বংস্তুপ থেকে বেরিয়ে আসতেই আমার প্রাণপ্রিয় বোন সায়্যিদা হালওয়াকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখলাম।

আফগান ভাইয়েরা (আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন) আমাদেরকে একটা বাসে তুলে দিলেন। আমাদেরকে তারা এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, "ভয় পাবেন না। আমরা আপনাদেরকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ"। আমরা বারবার জানতে চাচ্ছিলাম, "বেঁচে যাওয়া বাচ্চারা কোথায়? মেয়েরা কোথায়"? তাই তারা প্রথমে আমাদেরকে রেড ক্রিসেন্টের ক্লিনিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমরা সায়্যিদা হালওয়ার ছেলে সালাহ, তাসনীম আর নাসর ফাহমীর মেয়ে হাফসাকে খুঁজে পেলাম। সায়্যিদা হালওয়া তার ছেলেদেরকে

জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে থাকলো। আমি হাফসাকে জড়িয়ে ধরলাম, আমার দুই চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। আমাদের সাথে থাকা লোকদের একজন আমার কাছে জানতে চাইলেন, 'এ তোমার মেয়ে?' আমি বললাম, 'হ্যা, ও আমার মেয়ে'। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা দ্রুত ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে গেলাম বাকি মেয়েদের সাথে দেখা করতে।

****